# আমরা সুশিক্ষা এবং সুশিক্ষার কদরবিহীন জাতি হইতে পারি না

মইনুল হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাইতে হইয়াছে। এইসব স্থানে স্বল্প সময়ের জন্য হইলেও ঘনিষ্ঠ পরিবেশে দেশের শিক্ষক এবং সচেতন ব্যক্তিদের অংশবিশেষের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইয়াছি। যেহেতু সিনেট নির্বাচন শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত তাই স্বাভাবিকভাবেই দেশে বিদ্যমান শিক্ষার হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি নিয়া তাঁহারা তাঁহাদের দুশ্চিন্তার কথা আমাদেরকে শুনাইতে চাহিয়াছেন।

শিক্ষার নিম্নমান ও শিক্ষাঙ্গনে বিরাজিত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্য তাঁহাদের ক্ষোভ ও বিক্ষোভের শেষ নাই। উচ্চ শিক্ষা প্রদানের কেন্দ্র তথা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের নিরাপত্তা নাই। অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় থাকিতে হয় তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরা জীবিত ফিরিবে কিনা। শিক্ষার মানের ভয়াবহ অবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শিক্ষকদের ব্যর্থতারও সমালোচনা তাঁহারা করিয়াছেন। কেহ কেহ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন কত নিম্নমানের শিক্ষা তাহারা পাইতেছে। অনেকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন।

ফরিদপুর আইনজীবী সমিতির সভাপতি জনাব আহমদ হোসেন মিয়া তো ক্ষোভে-দুঃখে এই আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন যে, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতির উন্নতি না হইলে জাতি হিসাবে আমরা দস্যু ও ছিনতাইকারী বলিয়া পরিচিত হইবো।

শিক্ষা ধ্বংসের জন্য তাহাদের ক্ষোভ যতটা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাহার চাইতে অনেক বেশী দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে। সুশিক্ষিত হইতে সাহায্য করার পরিবর্তে দেশের তরুণদেরকে সন্ত্রাসী ও মাস্তান হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা। সংবাদপত্রের লোকদের বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ হইলো আমরা রাখিয়া-ঢাকিয়া কথা বলিতেছি। শিক্ষা ধ্বংসের জন্য এই রাজনৈতিক নেতাদের দায়ী করিয়া যথেষ্ট শক্তভাবে তেমন কিছু বলিতেছি না।

শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়া জনমনে গভীর ক্ষোভ দেখিয়া দায়িত্ব পালনে শিক্ষিত লোকদের ব্যর্থতার কথা নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম। আমাদের দেশের শিক্ষা ধ্বংসের কাজটি যে এখনই শুরু হইয়াছে তাহা নহে। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভের পর হইতেই যেন পরিকল্পিতভাবে উহা শুরু হইয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া নানাভাবে শিক্ষা ধ্বংসের কাজটি চলিবার পর এখন উহার ভয়াবহ রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং ভাবিতেছি দেশ ও জাতির কি সর্বনাশ হইয়াছে। যে দুঃখ রাখিবার নয় তাহা হইলো, দেশের শিক্ষা ধ্বংসের কাজটি শুরু হইলো জাতি গড়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়া। প্রথমেই শুরু হইলো ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে নূতন নূতন শ্লোগান। আমাদের বাঙালিত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা যেন বিরাট বাধা। বিদেশী ভাষা ইংরেজী শিক্ষা অর্থহীন।

স্বাধীন বাংলাদেশের বাঙালীদের 'বাঙালী' বানাইবার কাজে কিছু লোকের ব্যস্ততা দেখিয়া হতবাক হইয়াছি। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে একেবারে হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু যাঁহারা দেশ চালাইবার দায়িত্বে ছিলেন তাঁহারা মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের কৃতিত্বের কথা শুনাইতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়া অন্য কাহারও কথা শোনার সময় তাঁহাদের ছিল না। শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্র ঢুকাইয়া শিক্ষার পরিবর্তে ছাত্রদেরকে লিপ্ত করা হইলো সহিংস দলীয় রাজনীতিতে। সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রথম ও প্রধান টার্গেট করা হইলো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলিয়া খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হইলো। আর স্বাধীনতা অর্জনের পর শুরু হইলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা ধ্বংসের অস্ত্রের খেলা। যাহার অশুভ প্রভাব বিস্তার লাভ করিলো সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়। সহিংস রাজনীতির দায়িত্বহীনতা ও অনৈক্য জনজীবনকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিলো। সমাজে সুশিক্ষার নীতি-আদর্শ-গুরুত্ব হারাইতে শুরু করিলো।

স্বাধীনতার ২৭ বৎসর পর সংবাদপত্রের হেডিং ছাপা হইতেছে 'চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে চলিতেছে এইচএসসি পরীক্ষা'। দৈনিক ইত্তেফাকে ১২ই মে '৯৯ তারিখে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছেঃ 'যাহারা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অনেকেই প্রকাশ্যে নকল করিয়া এইচএসসি দিতেছে।' উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে, 'ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত চারিটি পরীক্ষায় নকলের অভিযোগে ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে বহিষ্কার করা হইয়াছে। নকল করায় বাধাদানের কারণেও বিভিন্ন স্থানে ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াওয়ের ঘটনা ঘটিয়াছে।' সাংবাদিক রেজানুর রহমান দুঃখ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'নকল বন্ধের ক্ষেত্রে সামাজিক এমনকি পারিবারিক প্রতিরোধ গড়িয়া উঠিতেছে না।'

ইহার দুইদিন পর ছাত্র ভর্তিতে 'ক্যাডারদের তান্ডব' শিরোনামে ইত্তেফাকে প্রকাশিত আনোয়ার আলদীনের অপর একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপাল ফজলুল কাদের চৌধুরী কলেজে ভর্তিতে কোটা দাবীদার ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসী ক্যাডারদের যৌথ আক্রমণে চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পর গতকাল (বৃহস্পতিবার) হইতে এক মাসের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। সন্ত্রাসীরা নাকি এইরূপ হুমকি দিয়াছে যে, প্রিন্সিপাল তাহাদের ফরম না দিলে তাহার লাশ কুত্তায় খাইবে।'

আমরা যদি সত্যকে সত্য হিসাবে তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম সংকট হইতে রক্ষা করিতে চাই তাহা হইলে তরুণ সন্ত্রাসী ছাত্রনেতাদের দোষী করিয়া কোন লাভ হইবে না। বরং তাহাদেরকে কিভাবে সুস্থ জীবনে ফিরাইয়া আনা যায় তাহা নিয়া আমাদের ভাবিতে হইবে। আমি তাহাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখিতে চাই যাহাদের ব্যর্থতার কারণে এবং যাহাদের মদদ পাইয়া ছাত্র হিসাবে ভর্তি হইয়া তাহারা সন্ত্রাসী হইয়াছে, মাস্তান বনিয়াছে। এইসব তরুণ শিক্ষালাভের জন্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়া যদি তাহারা সন্ত্রাসী হইতো, মাস্তান হইতো তাহা হইলে ভিন্ন কথা ছিল। অভিভাবকরা তাহাদের সন্তানদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন সুশিক্ষার জন্য। কোন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিকট নয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যদি তাহারা মাস্তান হইতো তাহা হইলে উহার তাৎপর্য ভিন্ন হইতো। দেখা যাইতেছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবেই তাহারা সন্ত্রাসী "বিদ্যা" অর্জন করিয়াছে। তাহাদের সন্ত্রাসী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুও হইলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

এই ছাত্ররা সন্ত্রাসী হইয়াছে প্রত্যক্ষভাবে দলীয় রাজনীতির সহযোগিতায় এবং তাহাদের লালন-পালন করিতেছেন রাজনৈতিক নেতারা। ইহা তো সবার জানা। এহেন রাজনৈতিক দায়িত্বহীনতার জন্য তাহারা অবশ্যই দোষী। তাঁহারা নিজেদেরকে যেহেতু জনগণের নেতা বলিয়া দাবী করেন তাই তাঁহাদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ থাকিবেই। জনগণের নিকট তাহাদের অপকর্মের জবাবদিহিতা করিতেই হইবে।

কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার কথা মনে থাকিলে কাহারও পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হইবে না যে, দেশে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা কতটা কি আশা করিতে পারি। দেশের শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকদের কোনকিছু করণীয় নাই এমন কথা বলা স্বাধীন দেশের জন্য শোভনীয় হইতে পারে না। তাঁহাদের হেফাজতে রক্ষিত তরুণ শিক্ষার্থীরা দলীয় রাজনীতির শিকার হইয়া মাস্তান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, তাহাদের রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই সেই শিক্ষকদের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব রহিয়াছে। শিক্ষাদানের পরিবেশ না থাকিলে, ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা না পাইলে শিক্ষকরাও যে আর শিক্ষক থাকেন না তাহা তো অন্য যে-কাহারও চাইতে তাহারাই বেশী বোঝেন। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইয়াছে। রাজনীতিবিদরা চাহিলেই যদি দেশের সব ধরনের ক্ষতি সাধন করিতে পারেন তাহা হইলে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এত সংগ্রাম দেশবাসী করিল কেন? শিক্ষিত-সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদের কোন মূল্য থাকে না যদি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সন্ত্রাসী রাজনীতির জন্য ক্যাডার রিক্রুটিং সেন্টার হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে বিএ-এমএ পাস করা ছেলে-মেয়েরা সরকারী বড় বড় দায়িত্বশীল পদে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত ১৮তম বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১৬ হাজার ৩শত ৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ২০.১১ জন বা ৩ হাজার ২শত ৯৫ জন ইংরেজী পরীক্ষায় শূন্য পাইয়াছে। ১০০ মার্কের মধ্যে ২৫ মার্কের নীচে পাইলে বিসিএস স্ট্যান্ডার্ডে উহা শূন্য বলিয়া গণ্য হয়। ইংরেজীতে শূন্য প্রাপ্তদের মধ্য হইতে পাঁচজনকে বিসিএস চাকুরীর জন্য যোগ্য গণ্য করা হইয়াছে। এই ৫ জনের ৩ জন শিক্ষা ক্যাডারে চাকুরী পাইবেন এবং তাহারা সম্ভবতঃ সরকারী কলেজের ইংরেজীর শিক্ষক হইবেন। সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯৯৮ সালের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টে এই তথ্য উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা পত্র-পত্রিকায়ও ছাপা হইয়াছে। দোষ 'শূন্য' মার্ক পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দিলেই সব সত্য বলা হইবে না। তাহারা যে 'শূন্য' শিক্ষা ব্যবস্থায় 'শূন্য' শিক্ষা পাইয়াছে তাহাও বলিতে হইবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের নিকট হইতেও তাহারা 'শূন্য' শিক্ষা পাইয়াছে। তাই ব্যর্থতা শিক্ষা ব্যবস্থার এবং শিক্ষকদেরও।

দলীয় রাজনীতি ও দলীয়করণের সংকট হইতে শিক্ষকরাও মুক্ত নন। শিক্ষার মান ও শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য দলীয় রাজনীতির অভিশাপ হইতে শুধু ছাত্র নয় শিক্ষকদেরও রক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নেতৃত্ব।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসী পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও যাহারা যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনা করিয়াছে তাহাদের চাকুরী পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই। যাহারা দলীয় রাজনীতির মাস্তান হইতে পারিয়াছে পরীক্ষায় 'শূন্য' পাইলেও তাহাদের জন্যই সরকারী চাকুরী পাওয়ার সুযোগ বেশী। ব্যবসা-বাণিজ্যের সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়াও তাহাদের জন্য সহজ। যোগ্যতা বা সততা নয়, দলীয় আনুগত্য ও দলীয়করণের প্রশ্নই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাঁদাবাজি করিতেও দলীয় রাজনীতির শক্তি প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই হতাশাও কম নয় যে, ভাল পড়াশুনা করিয়াও ভাল চাকুরী পাওয়া যায় না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের বেশী বেকারত্বের গ্লানি বহন করিতে হইতেছে। আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তুও এমন যে, শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের বোঝা লাঘব করার বিষয়টি গুরুত্ব পাইতেছে না। অর্থাৎ জাতীয় বা ব্যক্তি জীবনে শিক্ষাকে অর্থবহ করার চিন্তা-ভাবনা দেশে নাই। লুটেরা রাজনীতির ভাগাভাগি নিয়া ব্যস্ত থাকিলেই হইলো।

আমরা সবাই বলি শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, উন্নতি-অগ্রগতির চাবিকাঠি। স্বাধীন দেশ হিসাবে গর্ব করার মত বাংলাদেশ গড়ার জন্য কি ধরনের মেরুদন্ড আমরা তৈরী করিয়াছি, শিক্ষার মাধ্যমে কি ধরনের যোগ্য লোক তৈরী করিয়াছি তাহা ভাবিয়া দেখিলে ধরা পড়িবে দেশের কি সর্বনাশ করা হইয়াছে। একটি জাতিকে পঙ্গু করিয়া রাখার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলিতে দেওয়ার চাইতে ক্ষতিকর কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। স্বাধীন দেশে শিক্ষা ধ্বংসের রাজনীতি চলিতে পারে না।

এই সত্য জনজীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যে, দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে অন্যদেরকে দোষারোপ করা যথেষ্ট নয়। নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রশ্নে যোগ্যতা ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রাখিতে হইবে সবাইকে। শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি বন্ধের জন্য মানুষ গড়ার কাজে ন্যস্ত শিক্ষকদেরকেই অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহাদেরকেই বলিষ্ঠ প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে এইভাবেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত-সচেতন লোকদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখিতে হইবে।

আমরা নিশ্চয়ই এমন জাতি হইতে পারি না যে, আমাদের মাঝে সুশিক্ষা থাকিবে না, সুশিক্ষার কদর থাকিবে না।

JUN 14 1999